১২৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিক্ষামঞ্চের সব পাদপ্রদীপ জ্বালিয়ে দাও

ওবায়েদ-উল হক

বলা হয়েছে It's the universal rule. Children walk to school. Children run home. শিশুরা স্কুল বা পাঠশালায় যায় হেঁটে হয়ত কিছুটা অনিচ্ছায়। তারা বাড়ি ফেরে দৌড়ে। স্কুল শুরুর ঘণ্টা তাদের কানে সুধা বর্ষণ করে না। তারা উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে ছুটির ঘণ্টা শোনার জন্য। ছুটির ঘণ্টা শোনা মাত্রই তারা ছুটতে থাকে বাড়ির দিকে।

এটা সব দেশে সব সময়ের নিয়ম— এতে কোন ব্যতিক্রম নেই, সন্দেহ নেই। এর কারণ Home, sweet home-এর মতো স্কুলকে sweet school করা সম্ভব হয়নি। স্কুলকে বাড়ির মতো আকর্ষণীয় করা যায়নি। শুধু তাই নয়। স্কুলকে অনাকর্ষণীয় সকল ব্যবস্থাই করা হয়। তাই ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে না যাওয়ার অজুহাত খুঁজতো, আজও খোঁজে।

এই ব্যাপারে বেতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ কার্যকর। সর্ব রোগে ধন্বন্তরি ওষধির মতো বেত ছিল শিশু শিক্ষার্থীদের সকল দোষত্রুটির অমোঘ প্রতিকার। বেত হাতে শিক্ষক ছিল কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আজকের সন্ত্রাসীর প্রতীক। বেত্রদণ্ডের অকৃপণ ও অকরুণ ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ ছেলের গা ছম ছম করতো স্কুলে ঢুকতে। তখন মূলনীতি ছিল Spare the rod, spoil the child. শিশুকে ঠিক রাখার জন্য দণ্ডের ব্যবহার অনিবার্য ছিল। এখন, সুখের বিষয়, নীতি পাল্টেছে। এখন বলা হয় Spare the rod, save the child. দণ্ডের ব্যবহার বন্ধ কর, শিশুকে রক্ষা কর। এখন বেত্রের অসীম ক্ষমতা খর্ব করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে এটা উত্তম কথা।

তবে বেতের ভয় কাটলেও দারিদ্র্যের মার একটুও কমেনি। অশিক্ষিত গরিব মা-বাবা এখনও মনে করে যে, তাদের সন্তানদের শিক্ষা শুধু অপ্রয়োজনই নয়, বিলাসিতাও বটে। তাদের যুক্তি— শিক্ষা তাদের আহার দেবে না, শীত বস্ত্র দেবে না, থাকার ঠাঁই দেবে না। সে জন্যে তাদের লেখাপড়া নয়, করতে হবে কাজ, দিতে হবে শ্রম। নিরক্ষর গরিবের এই ভুল চিন্তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও ব্যয়হীন এবং সন্তানকে স্কুলে না পাঠানো গুরুতর অপরাধ— যে জন্যে অপরাধী মা-বাবাকে দণ্ড দেয়া হচ্ছে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক এমনি তা বলা যায় কি? শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে টিভি প্রচার যতটা হচ্ছে আসল কাজ ততটা হচ্ছে কিনা তা গবেষণা-সাপেক্ষ। ৮ জানুয়ারির জনকণ্ঠ-এর প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ শিরোনাম— প্রাথমিক স্তরের ১০ লাখ ছাত্রছাত্রীকে এবার বিনামূল্যে বই দেয়া হবে না। পড়ে পরিবেশটা প্রাথমিক শিক্ষার অনুকূল বলে মনে হয় কি? এই রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ঘোষণা করেছে যে, প্রাথমিক স্তরের প্রায় দশ লাখ ছাত্রছাত্রীকে এবার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেয়া হবে না। প্রায় এগারো হাজার বেসরকারী (ননরেজিস্টার্ড) ও এনজিও পরিচালিত স্কুলে এসব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক না পাওয়া গেলে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর বেশির ভাগই অচিরেই ঝরে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এই আশঙ্কা অমূলক নয়। এসব ফুল না ফুটতেই ঝরে পড়ে, এ অভিজ্ঞতা বিরল নয়।

এমন অবাঞ্ছিত পরিণতির কারণ কি? বলা হয়েছে— বিনামূল্যে সব ধরনের স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যাপারে এ বছরও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আমলাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে বলে জানা যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক সহকারী সচিব বিনামূল্যে বই বিতরণের পক্ষে চিঠি জারি করেছিলেন '৯৭-এর ১৩ ডিসেম্বরে। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর আশায় ছাই দিয়ে পয়লা জানুয়ারি অন্য এক সিনিয়র সহকারী সচিব এক চিঠি ইস্যু করে বলেছেন যে, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণের নীতি সরকার গ্রহণ করেনি। প্রথম চিঠিটি ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে জারি করা হয়েছে বিধায় তা কার্যকর হবে না। '৯৭ সালেও নাকি অনুরূপ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছিল যার সুরাহা করার জন্যে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু ঐ জটিলতার ফলে সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের বই পেতে মার্চ-এপ্রিল লেগে যায়। এ বছরও তেমনটি হবার আলামত দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ব্যাপারটি কি সত্যিই এতটা জটিল যে, এ নিয়ে সরকারের একই বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন মতভেদ থাকতে পারে— যার ফলে একই বিষয়ে দু'রকম পরস্পরবিরোধী চিঠি ইস্যু করা সম্ভব? প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কেউ নাকি কেবল সরকারী ও বেসরকারী রেজিস্টার্ড ৫৫ হাজার ৪শ' ৯১টি বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে তাঁদের যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি হবার কথা নয়। কারণ সরকারী নীতিবিরোধী কোন কাজ কেউ করতে পারেন না। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকার এতদিন সকল প্রকার বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ করেছে। এবার তার ব্যতিক্রম হবে কোন্ যুক্তিতে?

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিষয়টির প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেছেন— এ ঘটনা তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ঘটেছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এই জাতীয় ইস্যুটি এতই জরুরী যে, এ ব্যাপারে একটা স্থায়ী নীতি থাকার কথা। প্রতি জানুয়ারিতে নতুন করে নীতি নির্ধারণের কথা বোধগম্য নয়। সে যাই হোক, এই প্রতিবেদনের শিরোনামটি আবার উল্লেখ করতে হয়— প্রাথমিক স্তরের দশ লাখ ছাত্রছাত্রীকে এবার বিনামূল্যে বই দেয়া হবে না। দেয়া হলেও '৯৭ সালের মতো বিলম্বে দেয়া হবে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যাবার পর। এতে আর যাই হোক, দেশকে অবিলম্বে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা যাবে না এবং ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে না। শিক্ষা নিয়ে এমন হেলাফেলা আর কতকাল চলবে?

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতার পাশাপাশি সর্বোচ্চ স্তরের ডিগ্রী সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগটি যেমনি অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর ও উদ্বেগজনক তেমনি, কৌতুককর মনে হতে পারে। ৮ জানুয়ারির জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে নয় জন ভুয়া পিএইচডি ডিগ্রিধারী ও ভুয়া ডিএসসি ডিগ্রীধারী শিক্ষক রয়েছেন। এদের কয়েকজনের জন্ম তারিখ, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর বিবরণও নাকি জাল। বিদেশের এমন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও ডিএসসি ডিগ্রী লাভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে নাকি সন্দেহ রয়েছে। জাল সার্টিফিকেট দাখিল করে ঐ শিক্ষকেরা শুধু চাকরি লাভ নয়, বরং বছরের পর বছর পদোন্নতি ও অন্যান্য অবৈধ সুবিধা পেয়ে আসছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। শিক্ষা মানুষ ও পরিবেশকে আলোকিত করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিযোগ সব আলো নিভিয়ে দেয়ার নিশ্চিত লক্ষণ নয় কি?

দেশের গোটা শিক্ষা জগতটাই কিভাবে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার আলামত দেখা যাচ্ছে সব শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীবৃন্দের লাগাতার ধর্মঘটের খবরে। আমরা জানি যে, যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে অনন্যোপায় হয়ে ধর্মঘট করা একটি বৈধ প্রক্রিয়া। কিন্তু দেশের আটটি শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের এই ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ তা প্রশ্নাতীত নয়। যে চার দফা দাবিতে কর্মচারীরা ধর্মঘটে গিয়েছেন সেগুলো হচ্ছে (১) বোর্ডগুলোর দুর্নীতি সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের রিপোর্ট বাতিল করা, (২) আন্তঃবোর্ড বদলির সিদ্ধান্ত বাতিল করা, (৩) সকল বোর্ডে নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপন করা ও (৪) বোর্ডগুলোর ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। বোর্ডসমূহে অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের জন্যে সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্সের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ধর্মঘট করার অর্থ হচ্ছে— এসব অফিসে অব্যবস্থা, অনিয়ম ও দুর্নীতিকে সমর্থন করা। আন্তঃবোর্ড বদলি অসঙ্গত কিছু নয়। আর বোর্ডসমূহের ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধিকারকে অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করে তা বন্ধ করার দাবি জানানো মার্জনীয় সদাচরণের পর্যায়ে পড়ে কি না তাঁরাই তা প্রমাণ করুন। বস্তুত এই ধর্মঘটের মূল কথা বোর্ডসমূহের কর্তৃত্ব কর্মচারীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। সরকারকে তার হাত গুটিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর সকল রকম নিয়মশৃঙ্খলা বাতিলের দাবি উত্থাপিত হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে কি? অপরাপর সকল কর্মচারীর মতো শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও অবশ্যই সংরক্ষিত হতে হবে। এ কথা স্বীকার করেই অসহায় অভিভাবকেরা আন্তঃশিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশনের শ্রদ্ধেয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাঁদের এই ধর্মঘটের ফলে আগামী এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা যথাযথভাবে হতে পারবে কি? লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ছাত্রছাত্রীর অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনার কথা তারা ভাবছেন কি?

আশা করি এবার তাঁরা ভাববেন।